সূরা আন নহল-১ম রুকুঃ আয়াত সংখ্যাঃ(১-৯)

Sisters'Forum In Islam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَتٰۤی اَمۡرُ اللّٰهِ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوۡهُ ؕ سُبۡحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰی عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ ১৬ : ১

১. আল্লাহর আদেশ আসবেই; কাজেই তা তাড়াতাড়ি পেতে চেয়ো না। তিনি মহিমান্বিত এবং তারা যা শরীক করে তিনি তা থেকে উর্ধ্বে।

কোন ভূমিকা ছাড়াই আকস্মিকভাবে একটি সতর্কতামূলক বাক্যের সাহায্যে সূরার সূচনা করা হয়েছে। মক্কার কাফেররা বারবার বলতো, "আমরা যখন তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছি এবং প্রকাশ্যে তোমার বিরোধিতা করছি তখন তুমি আমাদের আল্লাহর যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো তা আসছে না কেন?" তাদের এ কথাটি বারবার বলার কারণ ছিল এই যে, তাদের মতে এটিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবী না হওয়ার সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট প্রমাণ। এর জবাবে বলা হয়েছে, আল্লাহর আযাব তো তোমাদের মাথার ওপর তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখন তা কেন দ্রুত তোমাদের ওপর নেমে পড়ছে না এজন্য হৈ চৈ করো না। বরং তোমরা যে সামান্য অবকাশ পাচ্ছো তার সুযোগ গ্রহণ করে আসল সত্য কথাটি অনুধাবন করার চেষ্টা করো। এর কারণ ছিল মুশরিকদের এই উক্তি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কেয়ামত ও আযাবের ভয় দেখায় এবং বলে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জয়ী করা এবং বিরোধীদেরকে শাস্তি দেয়ার ওয়াদা করেছেন। আমাদের তো এরূপ কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। এর উত্তরে বলা হয়েছেঃ আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। তোমরা তাড়াহুড়া করো না। [দেখুন, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

() অর্থাৎ তা একেবারে আসন্ন হয়ে উঠেছে। তার প্রকাশ ও প্রয়োগের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। ব্যাপারটা একেবারেই অবধারিত ও সুনিশ্চিত অথবা একান্ত নিকটবর্তী এ ধারণা দেবার জন্য ব্যাক্যটি অতীতকালের ক্রিয়াপদের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। [আদওয়াউল বায়ান; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] তবে এ "আদেশ বা ফায়সালা" কি ছিল এবং কোন আকৃতিতে এসেছে? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত আছেঃ

* কোন কোন মুফাসসির বলেন যে, এখানে 'আল্লাহর নির্দেশ' বলে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। এর এসে যাওয়ার অর্থও এই যে, আসা অতি নিকটবর্তী। সমগ্র জগতের বয়সের দিক দিয়ে দেখলে কেয়ামতের নিকটবর্তী হওয়া কিংবা এসে পৌছাও দূরবর্তী কোন বিষয় নয়। অথবা, তা অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে অতীতকালের পদ ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে, "মানুষের হিসেব-নিকেশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ১] আরও এসেছে, "কিয়ামত কাছাকাছি হয়েছে, আর চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে" [সূরা আল-কামারঃ ১] [ইবন কাসীর]

* কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ 'আল্লাহর নির্দেশ' বলে এখানে আল্লাহর আদেশ নিষেধ সম্পর্কিত, হালাল হারাম সম্বলিত বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী]

* কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এখানে 'আল্লাহর নির্দেশ' বলে তাদের উপর যে শাস্তি আসার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করাতেন তা বুঝানো হয়েছে। আযাবের ব্যাপারে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের সবরের পেয়ালা কানায় ভরে উঠেছিল এবং শেষ ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় এসে গিয়েছিল বলেই অতীতকালের ক্রিয়াপদ দ্বারা একথা বলা হয়েছে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

* এ নির্দেশ বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা থেকে হিজরতকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত নাযিলের কিছুদিন পরেই এ হিজরতের হুকুম দেয়া হয়। কুরআন অধ্যয়নে জানা যায়, যে সমাজে নবীর আগমন ঘটে তাদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান

একেবারে শেষ সীমানায় পৌঁছে গেলেই নবীকে হিজরতের হুকুম দেয়া হয়। এ হুকুম উল্লেখিত সমাজের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। এরপর হয় তাদের ওপর ধ্বংসাত্মক আযাব এসে যায় অথবা নবী ও তাঁর অনুসারীদের হাত দিয়ে তাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেয়া হয়। ইতিহাস থেকেও একথাই জানা যায়। হিজরত সংঘটিত হবার পর মক্কার কাফেররা মনে করলো ফায়সালা তাদের পক্ষেই হয়েছে। কিন্তু আট দশ বছরের মধ্যেই দুনিয়াবাসীরা দেখে নিল, শুধুমাত্র মক্কা থেকেই নয়, সমগ্র আরব ভূখণ্ড থেকেই শিরক ও কুফরীকে শিকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে।

() কাফের মুশরিকগণের চিরাচরিত নিয়ম ছিল যে, তারা আল্লাহর আযাবকে কামনা করত, তারা ভাবত যে আল্লাহর আযাব যদি আসবে তবে আসে না কেন? কিন্তু আল্লাহর নিয়ম হলো, তিনি কোন জাতিকে ধ্বংস করার পূর্বে তাকে প্রচুর সময় দেন। এ ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য আয়াতেও উল্লেখ করেছেন। [দেখুন, সূরা আল-আনকাবুতঃ ৫৩, ৫৪] [ইবন কাসীর]

এখানে তাদের শির্ক বলতে, তারা যে আযাব তাড়াতাড়ি চাচ্ছিল, অথবা কিয়ামত তাড়াতাড়ি চাচ্ছিল তা-ই বোঝানো হয়েছে। কেননা এর দ্বারা তারা মূলত: আল্লাহর ওয়াদাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেছে, এটা কুফর ও শির্ক। তারা মনে করছে যে, আল্লাহ এটা করতে সম্ভব নন। তিনি সেটা করতে পারবে না। আর অপারগতা মূলত: বান্দাদের গুণ। বান্দাদের গুণকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা শির্ক। এ হিসেবে তারা শির্কে লিপ্ত হয়েছিল। [ফাতহুল কাদীর] নতুবা আল্লাহর সাথে কারো শরীক হবার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর সত্তা এর অনেক উর্ধ্বে এবং এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। মোটকথাঃ তারা যে শির্ক করছে আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। একটি কঠোর সতর্কবাণীর মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত দেয়া এই আয়াতের সারমর্ম।

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ١٦ : ٢

২. তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছে স্বীয় নির্দেশে রূহ-ওহীসহ ফিরিশতা- পাঠান এ বলে যে, তোমরা সতর্ক কর, নিশ্চয় আমি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই; কাজেই তোমরা আমার ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন কর।

এখানে যার প্রতি ইচ্ছা বলে তাঁর নবী-রাসূলদের বুঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(১) যার প্রতি ইচ্ছে (عَلَىٰ مَن يَشَاءُ)

· মনোনয়ন: নবুওয়াত বা রিসালাত কোনো মানুষের চেষ্টা, সাধনা বা ধন-সম্পদের মাধ্যমে অর্জিত হয় না। এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার একক সিদ্ধান্ত ও অনুগ্রহ।

· যোগ্যতা: আল্লাহ ভালো করেই জানেন কাকে তাঁর বাণী প্রচারের জন্য মনোনীত করতে হবে। মক্কার কাফেররা যখন আপত্তি করত যে কেন কোনো বড় বা ধনী নেতার ওপর কুরআন নাজিল হলো না, তখন এই আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা এই মহান কাজের জন্য বেছে নেন।

এখানে الروح বলতে অহী (প্রত্যাদেশ)। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে,

{وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ}

অর্থাৎ, এভাবে আমি নিজ নির্দেশে তোমার প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) করেছি রূহ। তুমি তো জানতে না গ্রন্থ কি, ঈমান (বিশ্বাস) কি। (সূরা শূরা ৫২)

নবী রসূলগণ, যাঁদের উপর অহী অবতীর্ণ হত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

{اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} নবুঅতের দায়িত্ব কাকে দেবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (সূরা আনআম ১২৪)

{يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ} তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অহী করেন স্বীয় আদেশসহ, যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামত দিন সর্ম্পকে। (সূরা মু' মিন ১৫)

আয়াতে روح শব্দ বলে ইবনে আব্বাসের মতে ওহী বুঝানো হয়েছে। যা নবুওয়াতের রূহ। এ রূহ বা প্রাণসত্তায় উজ্জীবিত হয়েই নবী কাজ করেন ও কথা বলেন। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক জীবনে প্রাণের যে মর্যাদা এ ওহী ও নবুওয়াতী প্রাণসত্তা নৈতিক জীবনে সেই একই মর্যাদার অধিকারী। ওহী দ্বারা মুমিনদের প্রাণ উজ্জীবিত হয়। এ ওহীর একটি হচ্ছে কুরআন। দ্বীনে কুরআনের মর্যাদা যেমন শরীরের সাথে রূহের সম্পর্ক। [ফাতহুল কাদীর] তাই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ওহীর জন্য 'রূহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন তাফসীরবিদগণের মতে রূহ শব্দ দ্বারা এখানে হেদায়াত বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] অবশ্য দু' অর্থের মধ্যে বৈপরীত্য নেই।

এ আয়াতে ইতিহাসগত দলীল দ্বারা তাওহীদ প্রমাণিত হয়েছে যে, আদম 'আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে এবং বিভিন্ন সময়ে যে রাসূলই আগমন করেছেন তিনি জনসমক্ষে তাওহীদের বিশ্বাসই পেশ করেছেন। [দেখুন সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২৫] অথচ বাহ্যিক উপায়াদীর মাধ্যমে এক জনের অবস্থা ও শিক্ষা অন্যজনের মোটেই জানা ছিল না। চিন্তা করুন, হাজার হাজার নবী-রাসূল, যারা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন, তারা সবাই যখন একই বিষয়ের প্রবক্তা, তখন স্বভাবতঃই মানুষ একথা বুঝতে বাধ্য হয় যে, বিষয়টি ভ্রান্ত হতে পারে না। বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এককভাবে এ যুক্তিটিই যথেষ্ট।

() এই বাক্যের মাধ্যমে এ সত্যটি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, নবুওয়াতের রূহ যেখানেই যে ব্যক্তির ওপর অবতীর্ন হয়েছে সেখানেই তিনি এ একটিই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন যে সার্বভৌম কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত এবং একমাত্র তাকেই ভয় করতে হবে, তিনি একাই এর হকদার। তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় এমন কোন সত্তা নেই যার অসন্তুষ্টির ভয়, যার শাস্তির আশংকা এবং যার নাফরমানির অশুভ পরিণামের ভয় করা যাবে। তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করা যাবে না।

ফায়সালা কার্যকর করাবার দাবী জানিয়ে কাফেররা যে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছিল তার পেছনে যেহেতু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের অস্বীকৃতিও কার্যকর ছিল, তাই শিরক খণ্ডনের পরপরই তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তারা বলতো, এ ব্যক্তি যা বলছে, এসব মিথ্যা ও বানোয়াট। এর জবাবে আল্লাহ বলছেন, এ ব্যক্তি হচ্ছে আমার পাঠানো রূহ। এ রূহ ও প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হয়েই সে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করছে।

তারপর তিনি যে বান্দার ওপর চান এ রূহ নাযিল করেন ---একথার মাধ্যমে নবী করীমের ﷺ বিরুদ্ধে কাফেরদের একটি আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। কাফেররা আপত্তি করে বলতো, আল্লাহর যদি নবী পাঠাবার দরকার হয়ে থাকে তাহলে কেবলমাত্র আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদই ﷺ কি এ কাজের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছিল? মক্কা ও তায়েফের সমস্ত বড় বড় সরদাররা কি মরে গিয়েছিল? তাদের কারোর ওপর আল্লাহর দৃষ্টি পড়েনি? এ ধরনের অর্থহীন ও অযৌক্তিক আপত্তির জবাব এছাড়া আর কি হতে পারতো? এ কারণেই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এর এ জবাব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ নিজের কাজ সম্পর্কে নিজেই অবগত আছেন। তাঁর কাজের ব্যাপারে তোমাদের কাছ থেকে তাঁর পরামর্শ নেবার প্রয়োজন নেই। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যাকেই সঙ্গত মনে করেন নিজের কাজের জন্য নির্বাচিত করে নেন।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ بِالۡحَقِّ ؕ تَعٰلٰی عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ ৩ : ১৬

৩. তিনি যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারা যা শরীক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।

এখান থেকে আবার তাওহীদের দলীল-প্রমাণাদি পেশ করা হচ্ছে। [ফাতহুল কাদীর] প্রথমে আসমান ও যমীনকে আল্লাহ তা'আলা যে যথার্থরূপে সৃষ্টি করেছেন সেটা বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন কোন খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি। বরং এগুলোর সৃষ্টির পিছনে অনেক হিকমত রয়েছে। এগুলোর সৃষ্টি হক কারণেই হয়েছে আর তা হচ্ছে এগুলো আল্লাহর একত্ববাদ ও কুদরাতের উপর প্রমাণ জীবিত করতে সক্ষম। অথবা এগুলো নিজেরাই প্রমাণ করবে যে, এগুলো ধ্বংসশীল। [ফাতহুল কাদীর] তাছাড়া এগুলো সৃষ্টির পিছনে আল্লাহর এক মহান উদ্দেশ্য হলোঃ যারা খারাপ কাজ করেছে তাদেরকে শাস্তি আর যারা ভাল কাজ করেছে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন।

“আর আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। যাতে তিনি তাদের কাজের প্রতিফল দিতে পারেন যারা মন্দ কাজ করে এবং তাদেরকে তিনি উত্তম পুরস্কার দিতে পারেন যারা সৎকাজ করে” সূরা আন-নাজমঃ ৩১

وَ هُوَ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ بِالۡحَقِّ

তিনিই যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। সূরা আল-আন’আমঃ৭৩

() আল্লাহর সাথে যাদেরকে শরীক করা হয়, তারা কোনভাবেই আল্লাহর সমকক্ষ হতে পারে না। তিনি তাদের শরীক করা থেকে অনেক উর্ধ্বে, অনুরূপভাবে কোন শরীকের শরীক হওয়া থেকেও তিনি অনেক উর্ধ্বে। [ফাতহুল কাদীর] তিনি সর্বদিক থেকে উর্ধ্বে। সম্মানের দিক থেকে উর্ধ্বে তিনি, অবস্থানের দিক থেকেও তিনি আরশের উপর। সবকিছুর উপরে তাঁর অবস্থান, আর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দিক থেকেও তার সমকক্ষ কেউ নেই।

এই আয়াতের মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নিচে দেওয়া হলো:

· যথার্থতা ও উদ্দেশ্য (**بِالْحَقِّ**): আল্লাহ তাআলা এই মহাবিশ্ব আকাশ ও পৃথিবী কোনো খেল-তামাশা বা অনর্থক সৃষ্টি করেননি। এর পেছনে গভীর প্রজ্ঞা, নিয়ম এবং একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে।

· তাওহীদের প্রমাণ: মহাবিশ্বের সুশৃঙ্খল সৃষ্টি এবং নিখুঁত পরিচালনা প্রমাণ করে যে এর স্রষ্টা ও মালিক একমাত্র আল্লাহ।

· শিরকের অবসান: সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেহেতু অন্য কারও কোনো অংশীদারিত্ব নেই, তাই ইবাদত বা উপাসনার ক্ষেত্রেও আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও বাতিল।

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ

“তিনি আসমান ও যমীন সুপরিকল্পিতভাবে (যথাযথভাবে) সৃষ্টি করেছেন; তিনিই রাতকে দিনের ওপর এবং দিনকে রাতের ওপর জড়িয়ে দেন... সূরা আয-যুমার, আয়াত ৫:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ

“তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন? . সূরা ইবরাহীম, ১৯:

خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ نُّطۡفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيۡمٌ مُّبِيۡنٌ ۴ : ১৬

৪. তিনি শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন; অথচ দেখুন, সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী

এর দুই অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত এখানে এ দুই অর্থই প্রযোজ্য।

একটি অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ একটি তুচ্ছ শুক্রবিন্দু থেকে এমন মানুষ তৈরী করেছেন যে বিতর্ক ও যুক্তি প্রদর্শন করার যোগ্যতা রাখে এবং নিজের বক্তব্য ও দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে।

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, যে মানুষকে আল্লাহ শুক্রবিন্দুর মত নগণ্য জিনিস থেকে তৈরী করেছেন তার অহংকারের বাড়াবাড়িটা দেখো, সে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার মোকাবিলায় নিজেকে পেশ করার জন্য বিতর্কে নেমে এসেছে।

اَوَ لَمۡ يَرَ الۡاِنۡسَانُ اَنَّا خَلَقۡنٰهُ مِنۡ نُّطۡفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيۡمٌ مُّبِيۡنٌ

মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। সূরা ইয়াসীনঃ৭৭

(১) শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন (**مِنۡ نُّطۡفَةٍ**)

মানুষের আদি উৎস: এখানে 'নুৎফাহ' (نُّطۡفَةٍ) বলতে অতি তুচ্ছ তরল বা শুক্রবিন্দুকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার অত্যন্ত দুর্বল এবং নগণ্য সূচনার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

• স্রষ্টার অসীম ক্ষমতা: এক ফোঁটা তরল, যার নিজস্ব কোনো শক্তি বা রূপ নেই—তা থেকে আল্লাহ হাড়, মাংস, রক্ত, চোখ, কান এবং বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরি করেছেন। এটি আল্লাহর মহান সৃজনশীলতার এক অনবদ্য প্রমাণ।

শানকীতী বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি শুক্র থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সে শুক্র হচ্ছে পুরুষ ও মহিলার সম্মিলিত বীর্য। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "আমরা তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে।" [সূরা আল ইনসান: ২] অর্থাৎ পুরুষ ও মহিলার বীর্যের সংমিশ্রণে। এটা জানার পর আরও একটি জিনিস জানা দরকার, তাহচ্ছে অন্যত্র আল্লাহ জানিয়েছেন যে বীর্য সেটির একটি বের হয় পিঠ থেকে, সেটি পুরুষের শুক্র, অপরটি বের হয় বুকের উপরের পাঁজর থেকে, সেটি মহিলার শুক্র।

আল্লাহ বলেন, "অতএব মানুষ যেন চিন্তা করে দেখে তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে! তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে, এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পিঞ্জরাস্থীর মধ্য থেকে।" [সূরা আত-তারেকঃ ৫-৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ এবং আধুনিক বিজ্ঞান গবেষকগণ কয়েকটি চমৎকার দিক তুলে ধরেছেন:

• আদি কোষের অবস্থান (ভ্রূণতত্ত্ব): মানব ভ্রূণ যখন মায়ের জরায়ুতে বড় হতে থাকে, তখন মানুষের প্রজনন গ্রন্থি (পুরুষের শুক্রাশয়/Testis এবং নারীর ডিম্বাশয়/Ovary) প্রথমে তৈরি হয় মেরুদণ্ড ও বুকের পাঁজরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে (Kidney বা বৃক্কের কাছাকাছি জায়গায়)। পরবর্তীতে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে বা পরে এই গ্রন্থিগুলো নিচে নেমে আসে। অর্থাৎ, প্রজনন গ্রন্থির মূল উৎসস্থল বা আদি উৎপত্তি মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থানই।

• স্নায়ু ও রক্ত সঞ্চালন: চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী, বীর্য উৎপাদন এবং স্খলনের জন্য যে স্নায়ুবিক উদ্দীপনা এবং রক্তের প্রবাহ প্রয়োজন, তার মূল সংযোগ ও ধমনীগুলো মেরুদণ্ড (Spinal cord) এবং বুকের পাঁজরের ভেতরের অংশ থেকেই নেমে আসে।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার এই আদি ও তুচ্ছ উৎসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মূলত তার অহংকার চূর্ণ করতে চেয়েছেন, যেন সে স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিতণ্ডায় লিপ্ত না হয়।

প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী (**خَصِيمٌ مُّبِينٌ**)

· মানুষের অহংকার ও অবাধ্যতা: যে মানুষটি এত তুচ্ছ এক ফোঁটা পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছে, সে যখন বড় হয় এবং কথা বলার শক্তি পায়, তখন সে তার স্রষ্টার অস্তিত্ব, ক্ষমতা, পুনরুত্থান এবং বিধান নিয়েই প্রকাশ্যে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া শুরু করে দেয়।

· কৃতঘ্নতা: মানুষ তার নিজের আদি উৎস ভুলে গিয়ে স্রষ্টার মুখোমুখি দাঁড়ানোর ধৃষ্টতা দেখায়, যা তার চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয়।

মানুষকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে, বড় বড় বুলি আওড়ানোর আগে নিজের সত্তার দিকে একবার তাকাও। কোন আকারে কোথা থেকে বের হয়ে তুমি কোথায় এসে পৌঁছেছো? কোথায় তোমার প্রতিপালনের সূচনা হয়েছিল? তারপর কোন পথ দিয়ে বের হয়ে তুমি দুনিয়ায় এসেছো? তারপর কোন পর্যায় অতিক্রম করে তুমি যৌবন বয়সে পৌছেছে এখন নিজেকে বিস্মৃত হয়ে কার মুখের ওপর কথার তুবড়ি ছোটাচ্ছে?

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের এস্বভাবটি ব্যাখ্যা করেছেন। একবার তিনি তার হাতের তালুতে থুতু ফেললেন, তারপর তাতে তার তর্জনী রেখে বললেনঃ মহান আল্লাহ বলেন, হে বনী আদম! কিভাবে তুমি আমাকে অপারগ করতে পার? অথচ তোমাকে আমি এ ধরণের হীনতা থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর যখন তোমার রূহ ওখানে (তিনি তার কণ্ঠনালির দিকে ইঙ্গিত করলেন) পৌছে, তখন তুমি বলঃ আমি সাদকা করব। তখন কি তার আর সদকার সময় বাকী আছে? [ইবনে মাজাহঃ ২৭০৭; মুসনাদে আহমাদঃ ৪/২১০]

وَ لَقَدۡ صَرَّفۡنَا فِیۡ هٰذَا الۡقُرۡاٰنِ لِلنَّاسِ مِنۡ کُلِّ مَثَلٍ ؕ وَ کَانَ الۡاِنۡسَانُ اَکۡثَرَ شَیۡءٍ جَدَلًا

আর অবশ্যই আমরা মানুষের জন্য এ কুরআনে সব ধরনের উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। আর মানুষ সবচেয়ে বেশী বিতর্কপ্রিয়।সূরা কাহফঃ৫৪

সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক তর্কপ্রিয়। এর সমর্থনে আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ‘‘কেয়ামতের দিন কাফেরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পেশ করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হবেঃ আমার প্রেরিত রাসূল সম্পর্কে তোমার কর্মপন্থা কেমন ছিল? সে বলবেঃ হে আমার রব! আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম এবং তাদের আনুগত্য করেছিলাম। আল্লাহ্ তাআলা বলবেনঃ তোমার আমলনামা সামনে রাখা রয়েছে। এতে তো এমন কিছু নেই। লোকটি বলবেঃ আমি এই আমলনামা মানি না। আমি এ আমলনামার লেখকদেরকে চিনি না এবং আমল করার সময় তাদেরকে দেখিনি।

আল্লাহ তা’আলা বলবেনঃ সামনে লওহে-মাহফুয রয়েছে। এতেও তোমার অবস্থা এরূপই লিখিত রয়েছে। সে বলবেঃ হে আমার রব! আপনি আমাকে যুলুম থেকে আশ্রয় দিয়েছেন কি না? আল্লাহ বলবেনঃ নিশ্চয় যুলুম থেকে তুমি আমার আশ্রয়ে রয়েছ। সে বলবেঃ হে আমার রব! যেসব সাক্ষ্য আমি দেখিনি সেগুলো কিরূপে আমি

মানতে পারি? আমার নিজের পক্ষ হতে যে সাক্ষ্য হবে, আমি তাই মানতে পারি। তখন তার মুখ সীল করে দেয়া হবে এবং তার হাত-পা তার কুফর এবং শির্ক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' [দেখুন মুসলিমঃ ৫২৭১]

এক হাদীসে এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আলী ও ফাতেমাকে দেখতে গিয়েছিলেন, তাদেরকে তিনি বললেনঃ তোমরা রাতে সালাত আদায় কর না? তারা বললেনঃ আমরা ঘুমোলে আল্লাহ আমাদের প্রাণ হরণ করে তার হাতে নিয়ে নেন। সুতরাং আমরা কিভাবে সালাত আদায় করব? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে গেলেন, তারপর তাকে শুনলাম তিনি ফেরা অবস্থায় নিজের রানে আঘাত করছেন আর বলছেন, মানুষ ভীষণ ঝগড়াটে।" [বুখারীঃ ১১২৭, ৪৭২৪, মুসলিমঃ ৭৭৫] এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার পক্ষ থেকে এ ধরনের বিতণ্ডা অপছন্দ করলেন। কারণ, এটা বাতিল তর্ক। মহান আল্লাহর আনুগত্য না করার জন্য তাকদীরের দোহাই দেয়া জায়েয নেই।

হাদিসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন– "অহংকার হলো আমার চাদর আর বড়ত্ব হলো আমার ইজার। যে ব্যক্তি এগুলোর কোনোটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে, আমি তাকে শাস্তি দেব।" অহংকার কেবল মহান আল্লাহরই শোভা পায়, কারণ একমাত্র তিনিই সবকিছুর মালিক ও সর্বশক্তিমান

وَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّ مَنَافِعُ وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝ ১৬ : ৫

৫. আর চতুস্পদ জন্তুগুলো, তিনি তা সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য তাতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে। এবং সেগুলো থেকে তোমরা আহার করে থাক।

এখানে ঐসব বস্তু সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, যেগুলো মানুষের উপকারার্থে বিশেষভাবে সৃজিত হয়েছে। যেমন, উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তু। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] অধিকাংশ ক্ষেত্রে أنعام দ্বারা উট বোঝানো হয়ে থাকে। [কুরতুবী] এরপর এ সমস্ত জন্তু দ্বারা যে সব উপকার হয় তন্মধ্যে দুটি উপকার বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(এক) (لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ) অর্থাৎ এসব জন্তুর পশম দ্বারা মানুষ বস্ত্র এবং চামড়া দ্বারা পরিধেয়, টুপি ও বিছানা তৈরী করে শীতকালে উত্তাপ হাসিল করে। [তাবারী]

(দুই) (وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) অর্থাৎ মানুষ এসব জন্তু যবেহ করে খাদ্যও তৈরী করতে পারে। যতদিন জীবিত থাকে ততদিন দুধ দ্বারা উৎকৃষ্ট খাদ্য তৈরী করে। [ইবন কাসীর] অন্যান্য সাধারণ উপকার বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে- (وَمَنَافِعُ) বা উপকারাদী' অর্থাৎ জন্তুগুলোর মাংস, চামড়া, অস্থি ও পশমের মধ্যে আরো অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। কারও কারও মতে এর দ্বারা এগুলোকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করা বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] তবে সম্ভবত: এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে ঐসব নবাবিস্কৃত বস্তুর প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলো জৈব উপাদান দ্বারা মানুষের খাদ্য, পোষাক, ঔষধ ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়েছে অথবা ভবিষ্যতেও কিয়ামত পর্যন্ত আবিস্কৃত হবে।

আল্লাহ উক্ত অনুগ্রহের সাথে অন্য এক অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করছেন যে, চতুষ্পদ জন্তু (উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি) তিনিই সৃষ্টি করেছেন, যার লোম ও পশম হতে তোমরা গরম কাপড় তৈরী করে নিজেদেরকে শীত থেকে রক্ষা কর। অনুরূপ তাদের মাধ্যমে অন্যান্য উপকারও লাভ করে থাক, যেমন তাদের দুধ পান করা, তাদেরকে বাহনরূপে ব্যবহার করা, তাদের মাধ্যমে মালপত্র বহন করা, চাষ করা ইত্যাদি।

وَ لَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَ حِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝ ১৬ : ৬

৬. আর তোমরা যখন গোধূলি লগ্নে তাদেরকে চারণভূমি হতে ঘরে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন তাদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা তাদের সৌন্দর্য উপভোগ কর।

আগের আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুর ব্যবহারিক ও খাদ্যগত উপকারের কথা বলার পর, এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা এগুলোর মাধ্যমে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আনন্দ ও সামাজিক মর্যাদার দিকটি তুলে ধরেছেন।

• সৌন্দর্য ও মানসিক তৃপ্তি (**جَمَالٌ**): আল্লাহ তাআলা পশুপাখির মধ্যে কেবল মানুষের অর্থনৈতিক বা খাদ্যগত উপকারই রাখেননি, বরং এর মধ্যে একটি নান্দনিক সৌন্দর্যও দিয়েছেন। সকালে যখন দলে দলে পশু মাঠে চড়তে যায় এবং সন্ধ্যায় যখন তারা পেট ভরে সারিবদ্ধভাবে গোয়ালে ফিরে আসে, তখন সেই দৃশ্য মালিকের মনে এক অদ্ভুত প্রশান্তি, আনন্দ ও গর্বের অনুভূতি তৈরি করে।

· সামাজিক মর্যাদা ও সমৃদ্ধির প্রতীক: গ্রামীণ ও মরুভূমি সংস্কৃতিতে (এবং আজও কৃষিভিত্তিক সমাজে) যার যত বেশি গবাদি পশু থাকে, তাকে তত বেশি সমৃদ্ধ ও মর্যাদাবান মনে করা হয়। সকাল-সন্ধ্যায় পশুর এই যাতায়াত মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া রিযিক ও বরকতের এক জীবন্ত প্রদর্শনী।

• নান্দনিকতার স্বীকৃতি: ইসলাম যে কেবল কঠোর নিয়ম-কানুনের ধর্ম নয়, বরং মানুষের সহজাত সৌন্দর্যবোধ ও বিনোদনের আকাঙ্ক্ষাকেও মূল্য দেয়—এই আয়াতটি তার একটি বড় প্রমাণ।

تريحون যখন সন্ধ্যায় চারণভূমি থেকে বাড়িতে নিয়ে এসো, تسرحون যখন সকালে চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও। এই দুই সময় তারা মানুষের চোখে পড়ে, যাতে তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। উক্ত দুই সময় ছাড়া তারা দৃষ্টির আড়ালে থাকে বা আস্তাবলে বদ্ধ থাকে।

وَ تَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ ১৬ : ৭

৭. আর তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় এমন দেশে যেখানে প্রাণান্ত কষ্ট ছাড়া তোমরা পৌছতে পারতে না। তোমাদের রব তো অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু

এখানে এসব জন্তুর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এগুলো তোমাদের ভারী জিনিষপত্রকে দূর-দূরান্তের শহরে পৌছে দেয়, যেখানে তোমাদের এবং তোমাদের জিনিষপত্রের পৌছা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত সম্ভবপর নয়। উট ও গরু বিশেষভাবে মানুষের এ সেবা বিরাটাকারে সম্পন্ন করে থাকে। কারণ, এমনও অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে এসব নবাবিস্কৃত যান-বাহন অকেজো হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে এসব জন্তুকে আজো কাজে লাগায়।

“আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তার কিছু সংখ্যকের উপর তোমরা আরোহণ কর এবং কিছু সংখ্যক হতে তোমরা খাও। আর এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকার এবং যাতে তোমরা অন্তরে যা প্রয়োজন বোধ কর সেগুলো দ্বারা তা পূর্ণ করতে পার। সেগুলোর উপর ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়। আর তিনি তোমাদেরকে তার নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। অতএব, তোমরা আল্লাহর কোন কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে”? সূরা মুমিন/গাফেরঃ ৭৯-৮১

“আর তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে চতুষ্পদ জন্তুগুলোয়; তোমাদেরকে আমরা পান করাই তাদের পেটে যা আছে তা থেকে এবং তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা; আর তোমরা তা থেকে খাও। আর তাতে ও নৌযানে তোমাদের বহনও করা হয়ে থাকে”। সূরা আল-মু’মিনূনঃ ২১-২২

(২) অর্থাৎ আল্লাহ যেহেতু দয়ালু ও রহমতের আধার তাই তিনি তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এগুলোকে সৃষ্টি করে তোমাদের করায়ত্ব করে দিয়েছেন। [ইবন কাসীর] এ ব্যাপারে কুরআনের অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করা হয়েছে। [দেখুনঃ সূরা আয-যুখরুফঃ ১২-১৪]

وَّ الْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَ زِيْنَةً ؕ وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ৮ : ১৬

৮. আর তোমাদের আরোহনের জন্য এবং শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা জান না।

তাদের সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য ও উপকারিতা তাদেরকে বাহনরূপে ব্যবহার করা। তা সত্ত্বেও সেসব সৌন্দর্যের কারণও বটে।

উট, বলদ ইত্যাদির বোঝা বহনের কথা আলোচিত হওয়ার পর ঐসব জন্তুর কথা প্রসঙ্গতঃ উত্থাপন করা উপযুক্ত মনে করা হয়েছে, যেগুলো সৃষ্ট হয়েছে সওয়ারী ও বোঝা বহনের উদ্দেশ্যে। বলা হয়েছে, আমি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা এগুলোতে সওয়ার হও। আর তোমাদের শোভা ও সৌন্দর্যের উপকরণ হওয়াও এগুলোকে সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ। [তাবারী]।

-- বিপুল পরিমাণ জিনিস এমন আছে যা মানুষের উপকার করে যাচ্ছে। অথচ কোথায় কত সেবক তার সেবা করে যাচ্ছে বরং কি সেবা করছে সে সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না। সওয়ারীর তিনটি জন্তু ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করার পর পরিশেষে অন্যান্য যানবাহন সম্পর্কে ভবিষ্যত পদবাচ্যে ব্যবহার করে বলা হয়েছে- (وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’আলা ঐসব বস্তু সৃষ্টি করবেন, যেগুলো তোমরা জান না। যেমন, কীট-পতঙ্গ ও যমীনে অন্যান্য প্রাণী। যেগুলো যমীনের নীচে থাকে বা শুষ্ক স্থানে বা সমুদ্রে অবস্থান করে। যেগুলো মানুষ দেখতে পায়নি বা শুনতেও পায়নি। [কুরতুবী] কারও কারও মতে এখানে আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতে জান্নাতীদের জন্য এবং জাহান্নামে জাহান্নামীদের জন্য যা সৃষ্টি করবেন বা করেছেন তা-ই বুঝিয়েছেন। [কুরতুবী] তাছাড়া সম্ভবত: এখানে ঐসব নবাবিস্কৃত যানবাহন ও গাড়ী বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর অস্তিত্ব প্রাচীনকালে ছিল না; যেমন, রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি।

ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণে কোন কোন ফকীহ প্রমাণ করেছেন যে, ঘোড়াও হারাম যেমন গাধা ও খচ্চর হারাম। তাছাড়া খাদ্যরূপে ব্যবহার্য পশুর উল্লেখ প্রথমেই এসে গেছে। সেই কারণে এই আয়াতে যে সব পশুর উল্লেখ রয়েছে তা শুধু বাহনের জন্য। কিন্তু তাঁদের এই দলীল সঠিক নয়, কারণ

সহীহ হাদীসে ঘোড়ার গোশত হালাল হওয়ার কথা প্রমাণিত। জাবের (রাঃ) বলেন নবী (সাঃ) ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। (বুখারীঃ যবেহ অধ্যায়, মুসলিম শিকার অধ্যায়) তাছাড়া সাহাবায়ে কিরামগণ নবী (সাঃ) এর উপস্থিতিতে খাইবার ও মদীনায় ঘোড়া যবেহ করে গোশত রান্না করেছেন ও খেয়েছেন। আর নবী (সাঃ) নিষেধ করেননি। (দেখুন মুসলিম উক্ত অধ্যায়, আহমাদ ৩/৩৫৬, আবু দাউদঃ খাদ্য অধ্যায়) এই কারণে অধিকাংশ উলামা ঘোড়ার গোশত হালাল বলেছেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর) এখানে ঘোড়ার উল্লেখ শুধু বাহনরূপে করা হয়েছে। কারণ তার অধিক ব্যবহার এই উদ্দেশেই হয়ে থাকে এবং তা পৃথিবীতে সর্বযুগে এত বেশি মূল্যবান ও দামী থেকেছে যে তাকে খাবারের জন্য খুব কম ব্যবহার করা হয়েছে। ছাগল-ভেড়ার মত তা সাধারণতঃ যবেহ করে ভক্ষণ করা হয় না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বিনা স্পষ্ট প্রমাণে তাকে হারাম সাব্যস্ত করা যেতে পারে।

وَ عَلَى اللّٰهِ قَصۡدُ السَّبِيۡلِ وَ مِنۡهَا جَآئِرٌ ؕ وَ لَوۡ شَآءَ لَهَدٰىكُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ۹ : ১৬

৯. আর সরল পথ আল্লাহর কাছে পৌছায়, কিন্তু পথগুলোর মধ্যে বাঁকা পথও আছে। আর তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের সবাইকেই সৎপথে পরিচালিত করতেন।

(قَصۡدُ السَّبِيۡلِ) শব্দের অর্থঃ সরল পথ, মধ্যম পথ। এমন পথ যা উদ্দেশ্যে পৌছে দেয়। [কুরতুবী] এর দ্বারা এখানে ইসলাম, হক্ক পথ বুঝানো হয়েছে। [কুরতুবী]

‘ক্বসদ’ (قَصۡدُ) একটি আরবি শব্দ, যার বেশ কয়েকটি চমৎকার এবং গভীর অর্থ রয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় এবং সাধারণ আরবি ভাষায় এর মূল অর্থগুলো নিচে দেওয়া হলো:

• সোজা বা সরল পথ: এটি এমন একটি পথ যা কোনো দিকে না বেঁকে সরাসরি লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। (যেমন: ‘ক্বসদুস সাবীল’ অর্থ সরল পথ)।

• মধ্যমপন্থা বা ভারসাম্য: জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চরমপন্থা (অতিরিক্ত করা) এবং শিথিলতা (একেবারে ছেড়ে দেওয়া)—এই দুইয়ের মাঝখানের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানকে ‘ক্বসদ’ বলা হয়। ইসলামে ইবাদত, খরচ এবং জীবনযাপনে এই মধ্যমপন্থার ওপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়েছে।

• ইচ্ছা বা সংকল্প: কোনো কিছু করার জন্য মনে মনে দৃঢ় ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য পোষণ করাকেও ‘ক্বসদ’ বলা হয় (যেমন নিয়ত বা ক্বসদ করা)।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দুনিয়ার বাহ্যিক পথসমূহের বর্ণনার পর এ আয়াতে দ্বীনি পথের কথা আলোচনা করা হচ্ছে। দুনিয়াতে যেমন চলার পথ আল্লাহর সৃষ্টি তেমনি আখেরাতের পথে কিভাবে চলতে হবে তাও মহান আল্লাহ শিখিয়ে দিচ্ছেন। তিনি জানাচ্ছেন যে, হক পথ হচ্ছে সেটিই যা আল্লাহর কাছে পৌছায়। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও এসেছে, “আল্লাহ বললেন, এটাই আমার কাছে পৌছার সরল পথ।” [সূরা আল হিজর: ৪১] আরও বলেন,

وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِىۡ مُسۡتَقِيۡمًا فَاتَّبِعُوۡهُ ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَنۡ سَبِيۡلِهٖ ؕ ذٰلِكُمۡ وَصّٰىكُمۡ بِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ

“আর এ পথই আমার সরল পথ।কাজেই তোমরা এর অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। [সূরা আল-আনআমঃ ১৫৩]।

অথবা আয়াতের অর্থ, হক পথ বর্ণনা করা আল্লাহর যিম্মায়। তিনি সেটা রাসূল, দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে বর্ণনা করেন। [কুরতুবী: মুয়াসসার, আত-তাফসীরুস সহীহ]

هَٰذَا (এটি) বলতে কুরআনে মাজীদ অথবা দ্বীন ইসলাম বা সেই বিধি-বিধানগুলোকে বুঝানো হয়েছে, যা বিশেষভাবে এই সূরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হল, তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল। এগুলোই হল এমন তিনটি মূল নীতি, যার চতুর্দিকে দ্বীনের চাকা ঘুরছে। অতএব যে অর্থই নেওয়া হোক না কেন উদ্দেশ্য সবের একই

দুনিয়াতে যেমন অনেক পথ আছে কিন্তু সব পথই গন্তব্যস্থানে পৌছাতে পারে না শুধু সে পথই সঠিক গন্তব্যে পৌছাবে যে পথের সন্ধানদাতা সে পথ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, তেমনিভাবে দ্বীনি ব্যাপারেও অনেকে অনেক পথের দিকে আহবান জানাবে কিন্তু আল্লাহ্ তা’আলার প্রদর্শিত পথ ছাড়া অপরাপর কোন পথই সঠিক গন্তব্যে পৌছাতে সহযোগিতা করতে পারবে না। [সা’ দী]

তাওহীদ, রহমত ও রবুবীয়াতের যুক্তি পেশ করতে গিয়ে এখানে ইঙ্গিতে নবুওয়াতের পক্ষেও একটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এ যুক্তির সংক্ষিপ্তসার হচ্ছেঃ

দুনিয়ায় মানুষের জন্য চিন্তা ও কর্মের অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন পথ থাকা সম্ভব এবং কার্যত আছেও। এসব পথ তো আর একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না। সত্য একটিই এবং যে জীবনাদর্শটি এ সত্য অনুযায়ী গড়ে ওঠে সেটিই একমাত্র সত্য জীবনাদর্শ। অন্যদিকে কর্মেরও অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন পথ থাকা সম্ভব এবং এ পথগুলোর মধ্যে যেটি সঠিক জীবনাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় সেটিই একমাত্র সঠিক পথ।

এ সঠিক আদর্শ ও সঠিক কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। বরং এটিই তার আসল মৌলিক প্রয়োজন। কারণ অন্যান্য সমস্ত জিনিস তো মানুষের শুধুমাত্র এমন সব প্রয়োজন পূর্ণ করে যা একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রাণী হওয়ার কারণে তার জন্য অপরিহার্য হয়। কিন্তু এ একটিমাত্র প্রয়োজন শুধুমাত্র মানুষ হবার কারণে তার জন্য অপরিহার্য হয়। এটি যদি পূর্ণ না হয় তাহলে এর মানে দাঁড়ায় এই যে, মানুষের সমস্ত জীবনটাই নিষ্ফল ও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

এখন ভেবে দেখো, যে আল্লাহ তোমাদের অস্তিত্বদান করার আগে তোমাদের জন্য এতসব সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং যিনি অস্তিত্ব দান করার পর তোমাদের প্রাণী-জীবনের প্রত্যেকটি প্রয়োজন পূর্ণ করার এমন সূক্ষ্ম ও ব্যাপকতর ব্যবস্থা করেছেন, তোমরা কি তাঁর কাছে এটা আশা করো যে, তিনি তোমাদের মানবিক জীবনের এই সবচেয়ে বড় ও আসল প্রয়োজনটি পূর্ণ করার ব্যবস্থা না করে থাকবেন?

নবুওয়াতের মাধ্যমে এ ব্যবস্থাটিই তো করা হয়েছে। যদি নবুওয়াত না মানো তাহলে বলো তোমার মতে মানুষের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ অন্য কি ব্যবস্থা করেছেন? এর জবাবে তুমি একথা বলতে পারো না যে, পথের সন্ধান করার জন্য আল্লাহ আমাদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দিয়ে রেখেছেন। কারণ মানবিক বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি ইতিপূর্বেই এমন অসংখ্য পথ উদ্ভাবন করে ফেলেছে যা তার সত্য-সরল পথের সঠিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতার সুস্পষ্ট প্রামণ। আবার তুমি একথাও বলতে পারো না যে, আল্লাহ আমাদের পথ দেখাবার কোন ব্যবস্থা

করেননি। কারণ আল্লাহর ব্যাপারে এর চেয়ে বড় আর কোন কুধারণা হতেই পারে না যে, প্রাণী হবার দিক দিয়ে তোমাদের প্রতিপালন ও বিকাশ লাভের এতসব বিস্তারিত ও পূর্ণাংগ ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন অথচ মানুষ হবার দিক দিয়ে তোমাদের একেবারে অন্ধকারের বুকে পথ হারিয়ে উদভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়াবার ও পদে পদে ঠোকর খাবার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন।

"আর তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের সবাইকেই সৎপথে পরিচালিত করতেন" – কুরআনের এই বক্তব্যের সাথে মিল রেখে আরো কিছু সমার্থবোধক বা ব্যাখ্যামূলক রেফারেল আয়াত এবং হাদীস নিচে দেওয়া হলো:

আল্লাহ তাআলা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মানুষের হেদায়াত এবং আল্লাহর ইচ্ছার এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন:

"আর তোমার রব যদি ইচ্ছে করতেন, তবে যমীনে যারা আছে তারা সবাই একত্রে ঈমান আনত। তবে কি তুমি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে?" সূরা ইউনুস (আয়াত ৯৯):

---- আল্লাহ চাইলে পৃথিবীতে কাউকে কাফির বা মুশরিক রাখতেন না, সবাইকেই জোর করে বিশ্বাসী বানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু পরীক্ষা নেওয়ার জন্য তিনি মানুষকে বিশ্বাস করার বা না করার স্বাধীনতা দিয়েছেন।

"আমি ইচ্ছে করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সৎপথ প্রদর্শন করতাম; কিন্তু আমার এই কথা সত্য যে, আমি জিন ও মানব–উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই।" সূরা আস-সাজদাহ (আয়াত ১৩):

--- আল্লাহর হিদায়াত ও গোমরাহীর পেছনে একটি সুনির্দিষ্ট ইনসাফপূর্ণ নিয়ম রয়েছে। যারা নিজ থেকে অহংকার করে সত্যকে এড়িয়ে চলে, আল্লাহ তাদের জোর করে হিদায়াত দেন না।

"আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদের সবাইকে এক জাতি (একই ধর্মের অনুসারী) করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছে তাঁর রহমতে দাখিল করেন। আর যালিমদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।" সূরা আশ-শূরা (আয়াত ৮):

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন: "যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন যে–কর্মে তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম?" (সূরা আল-মূলক: ২)

আল্লাহ বলেন: "সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। অতএব যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা সে কুফরী করুক।" (সূরা আল-কাহাফ: ২৯)

সূরা আল-বালাদ-এর ১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন:

وَ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

"আর আমি তাকে (মানুষকে) দুটি পথ দেখিয়েছি।" (সূরা আল-বালাদ: ১০)

নাজদাইন' (النَّجْدَيْنِ) শব্দের অর্থ দুটি উঁচু বা স্পষ্ট পথ। তাফসীরবিদগণের (যেমন ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ রা.) মতে, এখানে দুটি পথ বলতে বোঝানো হয়েছে:

· خير (খায়ের): কল্যাণ, পুণ্য এবং জান্নাতের পথ।

· شر (শারর): অকল্যাণ, পাপ এবং জাহান্নামের পথ।

• সূরা আশ-শামস (আয়াত ৭-৮): "শপথ মানুষের আত্মার এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের (দুটি পথের) জ্ঞান দান করেছেন।"

• সূরা আদ-দাহর/আল-ইনসান (আয়াত ৩): "নিশ্চয়ই আমি তাকে পথ দেখিয়েছি; এখন সে চাইলে কৃতজ্ঞ হতে পারে, আবার চাইলে অকৃতজ্ঞও হতে পারে।"

কীভাবে আল্লাহ এই দুটি পথ দেখিয়েছেন?

আল্লাহ মানুষকে মূলত তিনটি উপায়ে এই পথগুলো চেনার ব্যবস্থা করেছেন:

১. ফিতরাত বা বিবেক: মানুষের ভেতরে একটা প্রাকৃতিক আলো রয়েছে, যা অন্যায় করলে খটকা জাগায় আর ভালো কাজ করলে শান্তি দেয়।

২. আকল বা বুদ্ধি: চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে মানুষ মহাবিশ্বের সৃষ্টি দেখে সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে।

৩. ওহী (নবী ও কিতাব): মানুষের বুদ্ধি যেন ভুল পথে না যায়, সেজন্য আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন এবং আসমানী কিতাব (যেমন কুরআন) দিয়ে ভালো-মন্দের সীমারেখা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।